প্রথমেই গন্ডগোল লাগল ফাগুলালের সঙ্গে। প্রতি বছরই এরকম হয়। লোকটা যেমন বেপরোয়া, তেমনই ঠ্যাটা।

সব গ্রামেই সাধারণত এক ধরনের মানুষ থাকে, বাপ-ঠাকুরদারা যা বলে গিয়েছেন, তা মেনে চলে, গণ্ডির বাইরে যেতে চায় না, সরপঞ্চ বা গুনিনদের নির্দেশ অমান্য করতে সাহস পায় না।

আবার প্রত্যেক গ্রামেই থাকেন একজন নিরেট বোকা। সে সব কথায় হে হে করে হাসে, যেমন ছোটে কুঁয়ার। আর থাকে একজন অতি চালাক। সেই এই ফাগুলাল।

ছোটে কুঁয়ার মোটাসোটা, মাঝারি উচ্চতা, লুঙ্গি পরে, কখনও কখনও একটা ছেঁড়াখোঁড়া খাকি প্যান্ট, কিন্তু কেউ কোনওদিন তার ওপর গায়ে জামা-টামা কিছু দেখেনি। তার বাবা আর্মিতে ছিল, পুঞ্চের যুদ্ধে মাটি নিয়েছে। ওই খাকি প্যান্টটা ছোটে কুঁয়ারের বাবার উত্তরাধিকার।

আর ফাগুলাল লম্বা, ছিপছিপে, মাথা ভরতি চুল, সে ফুলপ্যান্ট আর শার্ট পরে, খুব গরমের সময়ে গেঞ্জি, আর সব সময় তার গলায় বাঁধা থাকে একটা সবুজ রুমাল। তার গলার আওয়াজ তীক্ষ্ন, তাতে মিশে থাকে বিদ্রুপের ছোঁয়া।

ফাগুলাল মাঝে মাঝে শহরে ফুরন খাটতে যায়, তার মুখে পড়েছে সেই শহুরে ছাপ। অকারণেই সে রোজ দাড়ি কামায়।

ভালু আর গণেশদাস তার কাছে চাঁদা চাইতেই, সে ডান হাতের পাঞ্জা নাড়তে নাড়তে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'ভাগ হিঁয়াসে। চান্দা! যত্ত সব বুজরুক।'

গণেশদাস বলল, 'আরে হারামি, পঞ্চায়েত থেকে বলে দিয়েছে, সবকইকো পাঁচ রুপ্যে চান্দা দেনেই হোগা।'

ফাগুলাল হাসতে হাসতে বলল, 'আমি হারামি, তুইও হারামি। ঠিক হ্যায়? তোর বাপও হারামি। আমি পঞ্চায়েতের খাই না পরি? আমি টাউন থেকে পয়সা রোজগার করে আনি। সেই পয়সায় খাই। কখনও মাঠে যাই না!'

পেছন থেকে ছোটে কুঁয়ার হে হে করে হেসে উঠল।

গণেশদাস একটু চুপসে গিয়ে বলল, 'তুই পুকুরে গোসল করিস, সেটা পঞ্চায়েতের।'

ফাগুলাল বলল, 'সেটা আমার বাপের!'

গণেশদাস মনে মনে ঠিক করল, সরপঞ্চের কাছে এর নামে নালিশ করতে হবে। সে আর কথা বাড়ালো না।

ওরা হাঁটতে লাগল অন্য একটা বাড়ির দিকে।

আকাশে যেন গড়াচ্ছে আগ্নেয়গিরির লাভা। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি চলে এল। এখনও একটুও বৃষ্টি নামগন্ধ নেই, এ বছরে মেঘেরা যেন বুন্দেলাখণ্ডের কথা ভুলেই গেছে।

ভালু একবার পেছন ফিরে দেখল, ফাগুলালও আসছে তাদের সঙ্গে। ছোটে কুঁয়ার আছে, কিন্তু তার তো কোনও কাজকম্ম নেই, মানুষ দেখলেই সে পেছন পেছন ঘোরে।

ভালু জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোথা যাচ্ছিস রে ফাগু?'

ফাগুলাল বলল, 'মজাক মারতে যাচ্ছি, দেখি কে কে চান্দা দেয়!'

ভালু বলল, 'শালা তুই ছাড়া আর সব আদমি দেবে! তোর মতন আর তো কেউ টৌনে গিয়ে কেরেস্তান হয়নি।'

ফাগুলাল বলল, 'তোর এক চাচা টাউনে গিয়ে সেপাই হয়েছিল, তাই না? সে কি কেরেস্তান?'

এরা কেউই তর্ক করা পছন্দ করে না। দুটো-একটা কথার পরই যুক্তি ফুরিয়ে যায়। তাই ভালু বলল, 'যা ভাগ!'

ফাগুলাল তবু সঙ্গ ছাড়ল না।

একটা খেজুরগাছের তলায় দাঁড়িয়ে অছে সাহেবঝরি। তার সারা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ফুটিফাটা মাঠে পড়ে আছে তার হাত-লাঙল। এখন মাটি চষার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

তার নাম কেন সাহেবঝরি, তা এখন আর কেউ জানে না। ছেলেবেলা থেকে সবাই এই নাম শুনে আসছে। ওর গায়ের রং অন্য অনেকের তুলনায় ফরসা। বাবুদের মতন।

গণেশদাসের হাতে একটা থলি। সে বলল, 'এ সাহেবুয়া, দে, পাঁচ রুপ্যে চান্দা দে!'

সাহেবঝরি তার গামছার খুঁট খুলতে খুলতে বলল, 'তিন রুপ্যে এখন নিয়ে যা। আর দু রুপ্যে পরসোঁ দিয়ে দেবে, ক্রিরিয়া করে বলছি। ঠিক দিয়ে দেবে! আজ ঘরে ভাত নেই রে বুবুয়া!'

গণেশদাস বলল, 'বৃষ্টি না হলে যে সব্বাইকে না খেয়ে মরতে হবে! পরসোঁয় ঠিক দিবি তো বাকি দু-রুপ্যে?'

ফাগুলাল এগিয়ে এসে বলল, 'দিস না ঝরি। এক পয়সা দিস না। সব বুজরুকি!'

গণেশদাস আর ভালু দুজনেই তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। এটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। ফাগুলাল নিজে দিতে চাইছে না, সেটাই ক্ষমার অযোগ্য, তার ওপরে সে অন্যদের বাধা দিচ্ছে? এ গ্রামে এরকম কখনও হয়নি!

মুখখানা হিংস্র করে ভালু বলল, 'শালে, এবার এক ঝাপড় খাবি।'

ভালুর গাঁট্টাগোট্টা পেটা চেহারা, সে এরকম কথা বলতে পারে। তার সারা গায়ে, এমনকী হাতের তালুর পেছন দিকেও বড় বড় লোম, সেই জন্যই বোধহয় তার ডাক নাম ভালু।

কিন্তু সে কিছু করবার আগেই ছোটে কুঁয়ার ছুটে এসে এক চড় কষাল ফাগুলালের গালে। বেশ জোরেই মেরেছে। ফাগুলাল একটু টলে গেল।

এসব ক্ষেত্রে কেউ বাধা দেয় না। অন্যরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

ফাগুলাল প্রত্যাঘাত করল না, হাত বুলোতে লাগল গালে। তার পেশিতে আছে বিদ্যুৎশক্তি, শরীরে আছে নিহিত শক্তি। সে ইচ্ছে করলে ছোটে কুঁয়ারকে মেরে ছাতু করে দিতে পারে।

কিন্তু ফাগুলাল ভাবল, বেচারি অবোলা, অবোধ। কেন মেরেছে তা ও নিজেই জানে না। কয়েক মুহূর্ত বাদে সব ভুলে যাবে।

শান্তভাবে ফাগুলাল বলল, 'এইসান কভি নেহি মারনা কুঁয়ার। মানুষকে মারলে তার খুব লাগে। তোকে মারলে তোরও খুব লাগবে। তখন কী করবি?'

ছোটে কুঁয়ার কী বুঝল কে জানে, হেসে উঠল হি হি করে।

এইসময় দেখা গেল, দূর থেকে দু-একজন প্রবীণ ব্যক্তি হেঁটে আসছে। এ গ্রামের সবাই তাদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। সে সম্মান শুধু বয়সের কারণে, নইলে দু-জনের চেহারাতেই দারিদ্র্যের চিহ্ন প্রকট। একজনের গায়ে জড়ানো গামছাটাও শতচ্ছিন্ন।

সব বৃত্তান্ত শুনে, তাদের মধ্যে যার নাম শিবুমামা, সে বলল, 'এ কী কান্ড তুই করছিস রে ফাগু? তুই চান্দা দিবি না, তোর নাম আমি খারিজ করে দিয়েছি। কিন্তু তুই অন্যদের বারণ করছিস কোন সাহসে?'

ফাগুলাল বলল, 'বেঙা-বেঙরি বিয়ে দিলে বৃষ্টি হবে? ইয়ে সব বাকোয়াস! গরিবদের কাছ থেকে শুধু শুধু চান্দা নিচ্ছ!'

অন্য প্রবীণটির নাম মগনরাম। সে বলল, 'আলবাত হোবে! দু-সাল আগে হয়েছিল। মনে নেই? সবকইকো ইয়াদ হ্যায়।'

ফাগুলাল হেসে উঠে বলল, 'বেঙা-বেঙির বিয়ে? মামা, তুমি বলো তো, কোনটা বেঙা আর কোনটা বেঙি কেউ চেনে? বলো না, কেউ চেনে?'

ব্যাঙ পাওয়া মোটেই সহজ নয়। বর্ষার সময় ব্যাঙ ডাকে, এই প্রখর গ্রীষ্মে তারা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রধান পানীয় জলের পুকুরটাও এখন শুকিয়ে শুকিয়ে কাদা কাদা। সেখানে অনেক খুঁজে দুটো ব্যাঙ পেলেই হল। ডাক শুনে, ব্যাঙের লিঙ্গ চেনার মতো কান এখানকার কারোরই নেই।

তবু দুটো ব্যাঙ পাওয়া গেলেই তাদের ফুল-দুব্বো দিয়ে পুজো করা হয়। যে কোনও বিয়ের দৃশ্যের মতনই বউ-ঝিরা গান গায়, পুরুষরা নাচে, চাঁদার টাকায় মদ ও মাংস আসে। বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব। খরাক্লিষ্ট মানুষরা এই সময় একটা দিন অন্তত দুশ্চিন্তা ভুলে আনন্দে মেতে ওঠে।

পুণ্যবতী

যেহেতু আষাঢ় মাস, তাই দেরি হলেও বৃষ্টি তো হবারই কথা। ওই উৎসবের দু-এক দিনের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামলে সবাই ধরে নেয়, ব্যাঙের বিয়ের জন্যই বৃষ্টি ঢেলে দিল আকাশ।

শত শত বছর ধরে এই ব্যাপার চলে আসছে। এর একটা ভাল দিক তো আছে অবশ্যই।

অন্য কেউ যদি এরকম বেয়াদপি করত, তা হলে পঞ্চায়েতের সামনে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত তাকে।

ফাগুলালের ব্যাপারে সবাই একটু নরম, তার কারণ তার বাবা ছিলেন এ অঞ্চলের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। বহুদিন ধরে তিনি ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান। গরিব-দুঃখীদের জন্য তার মনে ছিল অনেক দরদ। তিনিই নিজের উদ্যোগে একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন। সেই সিয়ারাম ভগত-এর নাম উঠলেই এখনও অনেকে কপালে হাত ঠেকায়। তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন সাপের কামড়ে।

ফাগুলাল তার বাবার কোনও গুণই পায়নি। ছেলেটা একেবারে লাফাংগা! খালি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। ও তো টাউনে থাকলেই পারে, মাঝে মাঝে ফিরে আসে কেন? ওর মা এখনও বেঁচে আছে, সে বুড়ি এখন অন্ধ। ফাগুলাল কি ফিরে আসে তার মায়ের টানে? মোটেই না। প্রতিবেশীরা দেখেছে, মায়ের সঙ্গেও মোটেই তেমন সময় কাটায় না। এদিক-ওদিক ঘুরে খালি ফোঁপড়দালালি করে, আর লোকের পেছনে লাগে।

সিয়ারাম ভগতের প্রতি শ্রদ্ধাতেই তার ছেলেকে এখনও পর্যন্ত কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই অবস্থা কতদিন চলবে তার ঠিক নেই। অল্পবয়েসী ছেলেছোকরারা সিয়ারাম ভগতকে দেখেনি, তারা ফাগুলালের আস্পর্ধা সহ্য করবে কেন? কেউ কেউ বলে, 'পঞ্চায়েতের মিটিং -এ সবার সামনে যদি ওকে শাস্তি দেওয়া না যায়, তা হলে একদিন মাঠের মধ্যে ওর গলাটা কেটে রাখলেই তো হয়!'

শিবুমামা বলল, 'তোকে চান্দা দিতে হবে না। তুই যা এখান থেকে। আর কথা বাড়াসনি!'

ফাগুলাল বলল, 'আমি মন বদলে ফেলেছি। হ্যাঁ, চান্দা দিব। জরুর দিব। বিশ রুপ্যে। তবে এখন নয়। বেঙা-বেঙির শাদি হওয়ার দু'দিনের মধ্যে যদি বরাত শুরু হয়।'

শিবুমামা বলল, 'যা যা, ভাগ হিঁয়াসে।'

শনিবার দুপুরে বেঙা-বেঙির বিয়ে হল। তার মধ্যে একটা কোলাব্যাঙ, আর একটা বড়ই ছোট। তাদের কি আর এক জায়গায় বসিয়ে রাখা যায়? কোলাব্যাঙটার বোধহয় বিয়ে করার একেবারেই ইচ্ছে নেই, সে মাঝে মাঝেই তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে পালাতে চায়, আবার তাকে ধরে আনতে হয়।

হাঁড়িয়ার মদ জোগাড় হয়েছে প্রচুর। কয়েকজন ঢোল বাজাচ্ছে, স্ত্রীলোকেরা গাইছে সমস্বরে গান। এই একই গান তারা গায় বহু যুগ ধরে।

সন্ধে পর্যন্ত অনেক আমোদ-ফূর্তি হল। কয়েকজন এমনই মাতাল হল যে মাটি থেকে আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সারারাত ওখানেই শুয়ে থাকবে।

কোলাব্যাঙটা শেষ পর্যন্ত পালিয়েছে। ছোট ব্যাঙটার নড়বার লক্ষ্মণ নেই, মাঝে মাঝে কোঁক কোঁক শব্দ করছে। সে বেচারি বোধহয় বিয়ের দিনেই স্বামীহারা হয়ে দুঃখে কাঁদছে।

এই উৎসবের সময় ফাগুলালকে ধারে-কাছে দেখা গেল না। সে একটা গাছতলায় শুয়ে থেকে একটা ঘাসের ডগা মুখে নিয়ে চিবোয়। এটা তার খুব পছন্দের জায়গা।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন, তবু বৃষ্টির দেখা নেই। সকাল থেকেই সূর্য কটমট করে তাকিয়ে থাকেন। তিনি কোনও মেঘকে এদিকে ঘেঁষতে দেবেন না।

সবার চোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লাল হয়ে যায়। এই সময় বীজতলা তৈরি করতে না পারলে আর ফসল তোলার আশা থাকবে না।

ভালুর সঙ্গেও একদিন ফাগুলালের দেখা।

সে মিচকি হেসে বলল, 'বিশ রুপ্যে পেলি না তো?'

ভালু বলল, 'আরে যা যা। তোর টাকায় আমরা মুতে দিই। তোকে তো আর খেতির কাম-কাজ করতে হয় না।'

ফাগুলাল বলল, 'আমি টাউনে চলে যাব। সেখানে বরখা হচ্ছে, খবর পেয়েছি।'

বুড়ো বটগাছতলায় কয়েকজন প্রবীন লোক প্রায় সব সময়েই বসে থাকে। বিকেলের দিকে মাধো নামে একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে একটা সাংঘাতিক খবর দিল।

পাশের গাঁ বরমোতিয়ায় একটা সার্কাসের দল এসে তাঁবু ফেলেছে।

এই সময় সার্কাস? লোকের হাতে পয়সা নেই, কোনও বাড়িতেই প্রতিদিন উনুন জ্বলে না। পানীয় জলেও টান পড়েছে। এ গাঁয়ের পুকুরটা একেবারে খটখটে শুকনো, মেয়েরা তিন মাইল দূরের এক ঝোরা থেকে কলসি করে জল আনে। সে ঝোরাও এখন ছিরছিরে, একটা কলসি ভরতেই অনেকক্ষণ লাগে, মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়।

তবু সার্কাস দেখতেও যায় মানুষ। যেমন মদের ঠেক এই দুর্দিনেও বন্ধ হয় না।

একজন বলল, 'সার্কাসে এবার হাঁথি এনেছে? হাঁথি?'

শিবুমামা দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'চুপ শালো! হাঁথি? হাঁথি তোর ইয়েতে আমি ঢুকিয়ে দেবো! ওই সার্কাসের হারামিরা এসেছে, এখন এক মাইনা এক ফোঁটাও বৃষ্টি হবে না!'

সার্কাসের সঙ্গে অনাবৃষ্টির কী সম্পর্ক তা কেউ কেউ বুঝতে পারে না। এ ওর মুখে দিকে তাকায়।

শিবুমামা বলল, 'ঝড়-বৃষ্টি হলে সার্কাস চলে? তাই ওই শুয়োরের বাচ্চারা বৃষ্টি রুখে দেয়।'

'ওরা কী করে বৃষ্টি রুখে দেয়?'

'তুক করে।'

'কী করে তুক করে?'

'ওরা তাঁবু খাটাবার জন্য বড় বড় পেরেক আর গজাল পোঁতে মাটিতে। ওই লোহার গজালে মন্ত্র পড়ে দেয়। যতদিন সেই গজাল পোঁতা থাকবে, ততদিন আকাশে মেঘ আসবে না।'

যুক্তিটা এবার সবারই অকাট্য মনে হয়।

সত্যিই তো, বৃষ্টি পড়লে ওদের বেওসার ক্ষতি। বৃষ্টি হলে মানুষজন যাবে না। তাই ওরা মেঘ তাড়িয়ে দেয়। আর বৃষ্টির অভাবে যে এতগুলো গ্রামের মানুষ ধুঁকছে, তা ওদের খেয়াল নেই।

সার্কাসওয়ালাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমতে থাকে। প্রথমে কেউ কেউ বলে, সার্কাসের ম্যানিজারকে গিয়ে অনুরোধ করবে, সেই মন্ত্র-পড়া গজালটা তুলে দিতে মাটি থেকে।

ম্যানিজার যদি সে কথা না শোনে? কিংবা লোক দেখানো ভাবে অন্য একটা গজাল তুলে দিয়ে বলে, 'এই তো ফেলে দিলাম।'

দল বেঁধে সবাই চলল সেই সার্কাসের তাঁবুর দিকে। ক্রমশ দল বাড়তে লাগল। করোরই এখন কোনও কাজ নেই, এই একটা ভর-উত্তেজনার ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

ম্যানিজারবাবু প্রথমে ওদের কথা হেসে উড়িয়ে দিল। তারপর শুরু হল তর্কাতর্কি। আচমকাই শুরু হয়ে গেল ভাঙচুর।

লোকজনের হল্লার সঙ্গে মিশল জন্তু-জানোয়ারের নানারকম রব। বাঁদর আছে। দুটো ভাল্লুক, তিনটে হাতি, এমনকী একটা বাঘও রয়েছে।

খুব বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে ম্যানিজারবাবু একটা বন্দুক নিয়ে এসে দু'বার গুলি চালালো আকাশের দিকে। তারপর কড়া গলায় বলল, 'ঠিক হ্যায়। তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কত গেরাম আমাদের সেধে সেধে ডাকাডাকি করে, আমাদের কি যাওয়ার জায়গার অভাব? কিন্তু কেউ যদি আমার জানোয়ারদের গায়ে চোট লাগায়, তা হলে আমি গুলি চালাবো!'

দু'দিনের মধ্যে উৎখাত হয়ে গেল সার্কাস। তবু, কোথায় বৃষ্টি?

সার্কাসের তাঁবুগুলোর খুঁটি যখন উপড়ে ফেলা হচ্ছে, তখন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল ফাগুলাল। যেন একটা মজার দৃশ্য।

গোটা তিনেক মেয়েও ছিল সার্কাসের দলে, তারা ঝলমলে জাঙ্গিয়া আর গেঞ্জি পরে খেলা দেখায়। তারা নিজেদের পুঁটুলিগুলো বুকে নিয়ে গরুর গাড়িতে উঠতে উঠতে যা তা গালাগালি দিয়ে গেল এই গ্রামের মানুষদের।

দু'দিন পরেও যখন বৃষ্টি হল না, ফাগুলাল ভালুকে রাস্তায় ডেকে বলল, 'লোহার খুঁটি আর গজালগুলো সব উঠাকে লে গিয়ে কি নেহি, তা ভাল করে দেখেছিস তো ? উ লোগ রাগ করে যদি মন্তর করা গজালটা পুঁতে রেখে যায়, তা হলে এ-বছরই আর বৃষ্টি হবে না !'

তাই তো, এ কথাটা তো ঠিক। অনেকে দৌড়ে গেল সেই পরিত্যক্ত মাঠে। তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর দেখা গেল, সত্যিই তিনটে গজাল এখনও পোঁতা আছে মাটিতে। সেগুলো তুলে ফেলা হল, এর মধ্যে কোনটা মন্ত্রপুত ? এদের ফেলা হবে কোথায় ?

এক জায়গায় কাঠকুটো জড়ো করে আগুন লাগিয়ে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল সেই তিন লোহার টুকরোকে। সবাই জানে, আগুনে আঁচে সব খারাপ মন্ত্র খারিজ হয়ে যায়।

ওদিকে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে শুরু হয়েছে যজ্ঞ। এ জন্য চান্দা লাগে না। মন্দিরেই অনেক সম্পত্তি আছে। প্রতিদিন সেখানে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। শিপ্রা নদীর ধারে বহু মানুষ জমায়েত হয়ে দেখল সেই যজ্ঞ। কাঠ পুড়ল কয়েক মণ। তার মধ্যে কিছু চন্দন কাঠ। সত্যিকারের টিকি আর মোটা পৈতেধারী ব্রাহ্মণদের উঁচু গলায় মন্ত্র শুনে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়। উপস্থিত সবাইকে দেওয়া হল খিচুড়ি ভোগ।

তবু তো বৃষ্টি আসে না। গুজব শোনা গেল, এই যজ্ঞের ফলে সুদূর রেওয়া জেলায় কালো মেঘ জমেছে, কিন্তু এদিকে হাসিরপুরে আকাশ এখনও খাঁ খাঁ করে আছে।

এরপর আর একটাই পুজো বাকি আছে। তাতে উদ্যোগ নিতে হয় শুধু মেয়েদের। এ তল্লাটের নারীরা অনাত্মীয় পুরুষদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে না। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাবার সময় তারা মাথা ঢেকে রাখে পাল্লুতে। হিন্দু, মুসলমান সব একই রকম। এবারেই তো সরপঞ্চ হয়েছে শবনম বানু, খুবই তেজি নারী। কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটা পরদার আড়াল থাকে।

এ গ্রামে এখনও ইলেকটিরি আসেনি, দূরদর্শন নেই, কিন্তু রেডিও তো আছে কয়েকজনের। তারা আকাশবাণীর হিন্দি সমাচার শোনে। এ বছর প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন সোনিয়াজি না নিয়ে মনমোহন ভাইয়াকে ছেড়ে দিলেন, তা সবাই জানেন। বাজপেয়িজি হেরে গিয়ে মনের দুঃখে এখন সারাদিন ঘুমিয়ে থাকেন, ইন্দিরাজির ছোটি বহু বলে দিয়েছেন, আদমি লোগোকা মরনে দেও, লেকিন গরু-ভঁইস জবাই নেহি চলেগা। এসব খবরের চেয়েও সবাই শুনতে চায়, মেঘের কথা।

ভগবানকা কেয়া বিচার, একই তো দেশ, তবু বঙ্গাল আর গুজরাতে এত বৃষ্টি হয়েছে যে গাঁও কে গাঁও ডুবে যাচ্ছে, আর বুন্দেলাখণ্ডে ছোটে ছেলের কান্নার মতন কয়েক ফোঁটা বারিষও দিলে না ? বুন্দেলাখণ্ড কী দোষ করেছে ?

একজন বলল, 'আরে ভগবানকো আউর বহোত কাম-কাজ আছে, উসি লিয়ে ভগবান অন্য দেবতাদের ডিউটি ভাগ করে দিয়েছেন। বারিষকা দেওতা মালানদেব।'

এরা এখানে ইন্দ্রকে বলে মালানদেব। তাঁকে পুজো করার অধিকার শুধু নারীদের। সে সময় পুরুষদের ধারেকাছে যাওয়াও নিষেধ !

বহু বছর ধরেই এরকম ইন্দ্রপূজা চলে আসছে। কিন্তু গত দু'বছর হয়নি, কারণ কিছু ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে। খবর পেলেই টৌন থেকে ক্যামরা কাঁধে করে দলে দলে লোক ছুটে আসে, তারা কোনও কথাই শোনে না, ফটাফট তসবির খিঁচে নেয়। যে পূজা পুরুষদের দেখাই নিষেধ, তা তসবির যদি তুলে নেয়, তা হলে সারা গ্রামের মানুষেরই যে পাপ হয়।

তাই ওই পূজা বন্ধ করে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই জন্যই কি মালানদেব ক্রুদ্ধ, এই আকাশে মেঘ পাঠাচ্ছে না ?

বয়স্ক পুরুষরা কয়েকজন মিলে ঠিক করল, এবার এই পূজা আবার চালু করতেই হবে। উপায় তো নেই। এটাই শেষ চেষ্টা।

তবে সব কিছু সারতে হবে অতি গোপনে।

ইন্দ্রপুজো হয় অমাবস্যার রাতে।

সরপঞ্চ শবনম বানো ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিল, ওই দিন রাতে, সুরযদেও অস্তাচলে যাওয়ার পর কোনও পুরুষ আদমি ঘর থেকে বার হবে না। বড়কা মন্দিরের পূজারিণী রুকমাণি দেবীও জানিয়ে দিল যে, সেদিন কোনও বেহুদা কিংবা মতলববাজ যাই-ই হোক, পুরুষ যদি বিশেষ একজন রমণীকে দর্শন করে ফেলে, তা হলে সে পুরুষটির তো শাস্তি হবেই, নারীটিকেও দিতে হবে প্রচুর জরিমানা। কেন, নারীটিকে জরিমানা দিতে হবে কন ? নারীটি নিশ্চয়ই আগে কোনও পাপ করেছে কিংবা পুরুষটিকে জাদু করে টেনে এনেছে। স্ত্রীলোকটির সে জরিমানার পরিমাণ কম নয়, গ্রামশুদ্ধ সবাইকে খাওয়াতে হবে এক রাত। তাতে যদি তার ঘটি-বাটি, চাটি হয়ে যায় তা যাক।

একটাই রাস্তা বাইরে থেকে এ গ্রামে ঢুকেছে। সাত-আটজন নওজোয়ান বিকেল থেকে গ্রামের বাইরে একটা কালভার্টের ওপর বসে থাকবে। তারা আর সারারাত ঘরে ফিরবে না। টৌনের কোনও আখবারের লোক কিংবা ক্যামরাওয়ালারা যদি ইন্দ্রপূজার খবর শুনে ছুটে আসতে চায়, আটকানো হবে তাদের। প্রয়োজন হলে এরা লাঠি-ডান্ডা চালাতেও পিছপা হবে না। যেমন করে হোক এরা গ্রামের উজ্জত রক্ষা করবেই।

সমস্যাটা হতে পারে ছোটে কুঁয়ারকে নিয়ে। সে বুদ্ধুটা কিছুই না বুঝে রাত্রে বেরিয়ে পড়তে পারে। তাকে একটা ঘরের মধ্যে

শিকলি এঁটে রাখা হল। সুরযভান আর জুগনু নামের দুটো লোক, এক এক রাতে খুব বেশি নেশা করে ফেলে, তখন তারা কী করে ফেলবে ঠিক নেই। সুরযভান তো এক রাতে চুরচুর হয়ে, তার নিজের চাচিকে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ঝোঁপের দিকে, চাচির চ্যাঁচামেচি শুনে অনেকে ছুটে এসে সুরযভানকে বেদম মার দিয়েছিল। এদের দুজনকে রাখা হবে চোখে চোখে।

আর ফাগুলাল ? সেটাকে তো সামলানো দরকার। বাপের সুনাম ভাঙিয়ে সে হারামিটা আর কত বেয়াদপি চালবে ? কয়েকজন অবশ্য বলল, 'না, না, ওকে কিছু বোলো না, দেখি না, ও কী করে ?' মেয়েদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওকে দেখলেই সবাই মিলে একসঙ্গে চিৎকার করবে। তারপর মেয়েরাই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে দেবে ওর শিরদাঁড়া। একজন মেয়ের হাতে তো শাবল থাকবেই। এরপর দেখা যাবে, ফাগুলালের কত রস !

কিন্তু ফাগুলালের দেখাই পাওয়া যায়নি গত দু'দিন। ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে চলে গিয়েছে টৌনে। একবার গেলে সে একমাসের মধ্যে ফেরে না।

বৃদ্ধরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ! মারামারি জিনিসটা ভাল নয়। আর যাই হোক, সে তো সিয়ারাম ভগত-এর ব্যাটা। তাকে হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায় দেখলে অনেকেরই দিমাগ খারাপ হয়ে যেত।

ইন্দ্রপূজা হয় একটা অশ্বত্থ গাছের তলায়।

এ পূজায় কোনও মূর্তি লাগে না, একটা কাঠের দণ্ডের ডগায় লাগানো থাকে একটা তেকোণা সাদা ঝাণ্ডা। চিঁড়া, গুড় আর কলা হচ্ছে এই দেবতার উপচার। আগে তিলের সন্দেশও দেওয়া হত, কিন্তু এবারে যে পয়সার বড়ই অনটন।

পুণ্যবতী

সবাই জানে। বহুত বরষ আগে একবার বৃন্দাবনে এ রকম বর্ষণের খুব অভাব হয়েছিল। তখন অন্য মহিলাদের সঙ্গে রাধামাঈ এই পূজা করেছিলেন। সেবারে যা কান্ড হয়েছিল। পূজা শেষ হওয়ার আগেই কিষণজি কোথা থেকে দৌড়ে এসে পূজা কা পরসাদ খেতে শুরু করেছিল। আরে ছি ছি ছি, ইন্দর দেবতা অন্য কোনও পুরুষের দর্শনই সহ্য করতে পারেন না, এখন কী হবে ? পূজা সব বিফলে গেল ? সকলের মাথায় হাত, ভয়ে মুখ আমসি।

তখন আকাশে দৈববাণী হয়েছিল। স্বয়ং ইন্দ্রদেব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ‘আরে আনপড় আদমিলোগ, তোরা জানিস না, কিষণজি তো হামসে ভি বহুত বড়া দেওতা, সব দেওতাসে বড়া। আমি কিষণজির ওপর রাগ করতে পারি ? হাঁ, দুসরা কোই আদমি এইসান কিয়া তো আমি তোদের গ্রামে আগ লাগিয়ে দিতাম !’

কিষণজি তো এই কলিযুগে যখন তখন আসেন না, তই কঠোর নিয়ম হয়েছে, কোনও পুরুষের ছায়াও দেখা যাবে না এই পূজাকা টাইমপে।

রাধামাঈ যে গান গাইতেন, সেই গানই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে ঃ

চিঁড়া কুটেছি ইন্দর দেবতার জন্য, ফুলের মতন তাজা
এসো এসো ইন্দর দেবতা, তুমিই তো আমাদের রাজা।
কেলা এনেছি, গুড় এনেছি, মিশিয়েছি বুকের লহু
লহু হল মধু আর কাউয়া কোয়েলা কুহু।
কিষণ মহারাজ, দূরে থাকো, আমরা দুখিনী নারী
বালবাচ্চার মুখ শুখা হলো, গানা ভি গাইতে না পারি !

মোটামুটি এই কয়েকটি পংক্তি, একই রকম সুরে, গাওয়া হতে লাগল বারবার। মোট একশো আটবার। কে গুনল কে জানে ?

গান শেষ হওয়ার পর গড় হয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল সবাই। এ সময় বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকতে হয়।

এরপরে আসল পর্ব।

ইন্দ্র দেবতাকে গান শোনানো হল, খাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হল, তারপর তাঁকে অন্যভাবে খুশি করতে হবে না ?

এখন এইসব নারীদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করে পাঠানো হবে কৃষির মাঠে। যাকে নির্বাচন করা হবে, তার শরীরে কোনও রোগ-ভোগ থাকবে না। খোস-পাঁচড়া, ঘা, কাটা-ছেঁড়া থাকবে না, স্বাস্থ্য হবে ভাল।

আগে থেকেই অনেকটা ঠিক করা ছিল, সকলেই একবাক্যে বলল, প্রথমে পাঠানো হবে সরিতাকে। তার উমর খুব কম নয়। দেড় কুড়ি আরও আরও পাঁচ তো হবেই। সরিতা আবার বিধবা, সন্তানও নেই।

সরিতার আর শাদি হবে না, কিঁউকি পন্ডিতজি ছক কেটে বলে দিয়েছেন, আবার শাদি হলে আবার তার দুলহা মরবে। তার ভাগ্যে তার নিজস্ব ঘর-সংসার নেই। সে থাকে তার বড় ভাইয়ের বাড়িতে।

অন্তত চার-পাঁচজন জোয়ান মরদ সরিতাকে ঘরওয়ালি করতে চেয়েছিল। কিন্তু পন্ডিতজির গণনা শুনে পিছিয়ে গেছে। একজন মেয়েমানুষের জন্য কে আর মরতে চায় !

হাতে একটা লোহার শাবল নিয়ে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল সরিতা, তার সঙ্গে চলল আরও দুজন। ঠিক মেপে মেপে পঞ্চাশ পা গিয়ে থামবে, এরপর আর সঙ্গে কেউ যাবে না।

শাড়ি খুলল সরিতা। বুকের জামা, কোমরের শায়া সব খুলতে হল। সারা গায়ে আর একটুও সুতো নেই। তার ছাড়া পোশাক নিয়ে চলে গেল অন্য মেয়ে দুটি। ওরা পৌঁছে গেলে সবাই মিলে কয়েকবার উলু দেবে, তারপর সরিতার একলা যাত্রা শুরু।

একেবারে মিশমিশে অন্ধকার, নিজের হাত-পাও দেখা যায় না।

মেয়েমানুষ নিজের স্বামীর সামনেও নিভৃতে সব বস্ত্র খোলে না, স্নানের সময়ও কাপড় পরে থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সারা শরীর ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখাই অভ্যেস হয়ে গেছে। এই প্রথম সে পুরোপুরি নগ্ন, কেউ না দেখলেও হাঁটতে গেলে জড়তা এসে যায়। কিন্তু ইন্দ্রপূজার যে এটাই রীতি।

কেউই দেখছে না, কিন্তু ইন্দ্র দেবতা তো দেখছে। দেওতারা আন্ধারেও দেখতে পায়। ইন্দর দেওতা তো পুরুষ। সরিতা যেন সেই অদৃশ্য পুরুষের দৃষ্টি টের পাচ্ছে।

আন্দাজে আন্দাজে হেঁটে সরিতা পৌঁছে গেল কৃষির মাঠে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। এইসময় মাঠ পানিতে ভিজে ভিজে থাকার কথা। আহা রে, একফোঁটাও জল না পেয়ে ঝিঁঝিঁ পোকাগুলোর ডাক যেন ফাটা ফাটা।

হাতের শাবলটা তুলে মাটিতে একটা কোপ দিল সরিতা। ঠিক সাতবার কোপ দিতে হবে। তারপর সেই গর্ত ঘিরে নাচতে হবে সাত পাক। তবে যদি ইন্দর দেওতা খুশ হন। আজ রাত্তিরেই যদি বারিষ হয়, তবে বুঝতে হবে ইন্দর দেওতার খুব পসন্দ হয়েছে এই মেয়ের নাচ।

মাটি এত শক্ত যে এক একবার ঠং ঠং করে শব্দ হচ্ছে শাবল মারার পর। ভাল করে গর্ত খুঁড়তে হবে, কাল সকালে এসে পরীক্ষা করে দেখবে পুরুষরা। যদি বোঝে যে, মেয়েটি ফাঁকি মেরেছে, তা হলেও শাস্তি পেতে হবে।

কোনও কোনও বছর ইন্দ্র দেবতা নাকি এই সময় একেবারে মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ান। শাবল চালাতে চালাতে সরিতা ভাবতে লাগল, আকাশের দেওতা কি সত্যি সত্যি জমিতে পা ছোঁয়ান ? বারবার সে এদিক ওদিক ফিরে ফিরে দেখতে লাগল, যদিও সে জানে, এত অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না। কিংবা দেওতাদের গায়ের রং-ই তো চেরাগ বাতির মতন।

মোটামুটি একটা গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। এইবার নাচ।

জীবনে আর কোনও পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য তাকে কিছু করতে হবে না। পুরুষরা তাকে ভয় পায়। তার স্পর্শেই আছে মৃত্যু। দেওতাদের তো সে ভয় নেই। দেওতারা অমর।

এক পাক নাচের পরই শরীরটা কেঁপে উঠল সরিতার। কিছু একটা শব্দ শোনা গেল কি ? না, কীসেরই বা শব্দ হবে ! একটু বাতাসও নেই যে উড়বে গাছের শুকনো পাতা।

একটু পরে আবার শব্দ। কেমন যেন অশরীরী, অপ্রাকৃত ব্যাপার।

সরিতার একবার ইচ্ছে হল, ছুটে ফিরে যেতে। সাত পাক নাচ হোক বা না হোক, কেউ তো বুঝবে না। কিন্তু দেওতা ঠিক বুঝবে। পুজোর নিয়ম ভাঙা হবে। পাপ হবে সারা গ্রামের মানুষের। মন দিয়েই সে সম্পূর্ণ করল সাত পাক নাচ। তারপর চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাতেই মনে হল, এক জায়গায় যেন অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। পুরুষ মূর্তির মতন।

তার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সে কী চোখে ভুল দেখছে ? এখানে এখন কোনও মানুষ আসবে কী করে ? তবে কি দেবতা স্বয়ং ? তাও কি হয় ? দেওতা হলে সেই চেরাগ বাতি কই ? কোনও পুরুষ দেবতার গায়ের রং কালো হয় না।

ছুটে যে পালাবে সরিতা, সে সাধ্যও নেই, পা যেন গেঁথে গেছে মাটিতে। কাঁপা কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কউন ?'

সে খুব আশা করেছিল, কোনও উত্তর পাবে না। ওখানে আসলে কেউ নেই। ওই জমাট অন্ধকার তার মনের ভুল।

কিন্তু উত্তর এল। এক ভরাট পুরুষকণ্ঠ বলল, 'ম্যায় হুঁ মালানদেও।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল সরিতার। কেটে গেল ভয়। মালানদেও না ছাই ! ও গলার আওয়াজ সে চেনে।

লজ্জা নিবারণের জন্য এক হাতে বুক ও অন্য হাতে যোনিদেশ চাপা দিয়ে সে বলল, 'আরে বেওকুফ কাঁহিকা ! তু ইধার আয়া ? মরনেকা ডর নেহি তুহার ?'

লঘু হাস্য করে সেই অন্ধকার মূর্তি এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'তেরা নাচ বহোত আচ্ছা লাগা ! আগেই থামলি কেন ? পুরা সাত পাক হয়নি। তুই ফাঁকি মেরেছিস !'

সরিতা বলল, 'আলবাত সাত বার নেচেছি। তা ছাড়া, তুই গুণবার কে ? তুই কি নালিশ করতে যাবি ?'

ফাগুলাল বলল, 'না, নালিশ করতে যাবো না। আর একটু নাচ না !'

সরিতা বলল, 'তুই তো এখনই মরবি ! এবার ভগতজির নামেও কেউ তোকে বাঁচাবে না !'

ফাগুলাল বলল, 'আমায় কে মারবে ? কার সাধ্য আছে ?'

সরিতা বলল, 'আমি চিল্লাব। সবাই ছুটে আসবে, তোকে ছাতু করে দেবে ! যদি ওরা দেরি করে, আমার কাছেও লোহার শাবল আছে !'

আবার হেসে ফাগুলাল বলল, 'তুই মারবি আমাকে ? তা হলে তো পন্ডিতজির কথাই সত্যি হয়ে যাবে। তোর কাছে এলে মরদরা বাঁচে না ! তবে, মার আমাকে !'

সে আরও কাছে এসে সরিতার কাঁধে হাত রাখল।

সরিতা বলল, ‘সত্যি আমি চ্যাঁচাব ! আরে ছি ছি, তোর একটুও কি শরম নেই রে ? আমি মালানদেও-র পূজা দিতে এসেছি, তুই ছুঁয়ে দিলি, আমার কত পাপ হল। এখন মালানদেও আর বারিষ দেবে না ! রাগ করে আকাশে আগুন ছাড়িয়ে রাখবে !’

ফাগুলাল বলল, ‘শোন সরিতা, আমি পাপ জানি, পুণ্যও জানি। গাঁয়ের বেহুদা আদমিলোগ শাস্তর ভুলে গেছে, পড়া-লিখা তো কিছু করে না। এই উদ্রপূজার রাত, যে পূজা দিতে আসে, সে হয় ভূমি। আর পুরুষ হয় আকাশ। ভূমি আর আকাশের মিলন না হলে বারিষ হবে কী করে ? সরিতা, তুই বুঝিস না, আমি তোর জন্যই টাউন থেকে বারবার গাঁয়ে ছুটে আসি। তোকে আমি টাউনে নিয়ে যাব, মন্দিরে পূজা দিয়ে তুই আমার ঘরওয়ালি হবি। টাউনে কেউ জাতের পরোয়া করে না।’

সরিতা এবার কান্নাভেজা গলায় বলল, ‘অমন কথা বলিস না ! তুই আমায় শাদি করলে তোর মরণ হবে। তুই যা, যা, এখনি চলে যা ! আমি তোর মরণ চাই না !’

ফাগুলাল বলল, ‘আমি চাই ! তুই আমাকে মেরে ফ্যাল সরিতা, তা হলে আমার শরীর জুড়োবে ! আর ছোঁটাছুটি করতে হবে না। মরণের আগে, শুধু একবার ...’

সরিতা বলল, ‘না, না। ফাগু, তুই কেন মরবি। আমি মরলে বরং কারোর ক্ষতি নেই দুনিয়ায়। আমার মতন বেওয়ারিশ মেয়েমানুষের তো মৃত্যুতেই মুক্তি মেলে !’

ফাগুলাল বলল, ‘টাউনে গিয়ে তুই আমার সঙ্গে বাঁচতে পারিস। অন্তত যতদিন বাঁচা যায়। ভালোবাসা দিয়ে আমরা পণ্ডিতজির কথা মিথ্যে করে দিতে পারি !’

সরিতা বলল, ‘এসব তুই কী বলছিস ফাগু ? আমার সারা শরীর কাঁপছে। হা ভগওয়ান, আমায় আর কত দুঃখ দেবে ?’

হঠাৎ আকাশ চিরে দেখা গেল বিদ্যুৎঝলক। সেই আলোকে সরিতাকে দেখল ফাগুলাল। একেবারে আদিম মানবী।

তার কয়েক মুহূর্ত পরেই বজ্রগর্জন।

সরিতা বলল, ‘ওই দ্যাখ, মালানদেও ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে ধমকাচ্ছে !’

ফাগুলাল বলল, ‘বারিষের আগে আকাশ ডাকে। সেই গর্জন তো পৃথিবীকে ধমকায় না ! ঝড়কে বকুনি দেয়। বলে, হঠ যাও, হঠ যাও ! এখন আর কেউ থাকবে না ! এখানেও আর কেউ নেই। আয় সরিতা।’

তারপর সরিতা হল ভূমি আর ফাগুলাল হল আকাশ। তাদের মিলন হল। সেই মিলনখেলা যেন চলতে লাগল অনন্তকাল।

খানিকবাদে দুজন শুয়ে রইল পাশাপাশি। দুজনেরই শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আকাশে বিদ্যুৎচমক এখন ঘন ঘন। বৃষ্টি একেবারে আসন্ন। হয়তো কাকতালীয়। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, বৃষ্টি একদিন না একদিন তো আসবেই। তবু আজই, এখনই বৃষ্টি নেমে সরিতাকে পুণ্যবতী করে দিল।

জুঁইফুলের মতন এক-একটা বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়তে লাগল ওদের শরীরে।

সরিতা আবেগ-জড়ানো কণ্ঠে বলল, ‘যা ফাগু, তুই এবার জঙ্গলের দিক দিয়ে চলে যা !’

ফাগুলাল বলল, ‘তুই আমার সঙ্গে টাউনে যাবি না ?’

সরিতা ত্রস্ত হয়ে বলল, ‘ওই যেন অনেকের গলা শুনতে পাচ্ছি। যা, এখন যা। তোকে দেখলে সব ঝুট হয়ে যাবে !’

ফাগুলাল বলল, ‘আমার যেতে ইচ্ছে করছে না যে !’

তবু সরিতার তাড়নায় তাকে উঠতে হল। নিজের পোশাক তুলে নিয়ে সে মিলিয়ে গেল বিপরীত দিকের অন্ধকারে।

আগে ছুটে এল মেয়ের দল। একজনের হাতে সরিতার শাড়ি, জামা। তারপর এল গাঁয়ের সমস্ত পুরুষ। সবাই ইন্দ্রদেবতার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। নাচ শুরু করেছে মেয়েরা, সরিতা তাদের মধ্যমণি।

মাটিতে পড়ে আছে ফাগুলালের কয়েক ফোঁটা বীর্য। এখুনি তা বৃষ্টির সঙ্গে মিশে যাবে !